সুড়ঙ্গ

রূপক সাহা

ভূমিকা

বছরখানেক আগে 'এবেলা' কাগজে 'ইদুরঙ্গ' শিরোনামে একটা প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল। কলকাতায় ইঁদুরদের সাম্রাজ্য কতদূর বিস্তৃত, সে সম্পর্কে বিশদ বিবরণ ছিল সেই লেখায়। কার্জন পার্ক যদি ইঁদুরদের হেড কোয়ার্টারস হয়, তা হলে উত্তরে আরজিকর হাসপাতাল, দক্ষিণে গল্ফ ক্লাব পর্যন্ত সেটি ছড়ানো। ইঁদুরের সংখ্যা কেন বাড়ছে, তা নিয়ে কয়েকজন জীববিজ্ঞানীর মতামতও সেই লেখায় ছিল। কৌতূহল বাড়ায় খোঁজ নিতে শুরু করলাম, দেশের অন্য মহানগরগুলোর অবস্থাটা কী? মুম্বাই, চেন্নাই বা দিল্লিও কি ইঁদুর সমস্যায় জর্জরিত? দেখলাম, সবথেকে দুরবস্থা মুম্বাইয়ের। গণপতি বাপ্পার রোষে পড়ার ভয়ে সাধারণ মানুষ সেখানে ইঁদুর মারতে চান না। ফলে মুম্বাইয়ে ইঁদুরের সংখ্যা প্রায় ন কোটির মতো। ভিক্টোরিয়া টার্মিনাসের মতো ব্যস্ত একটা রেল স্টেশনেও লোকে রাতে যেতে চান না, ইঁদুরের অত্যাচারে।

মুম্বাইয়ের পুরকর্তারা বাধ্য হয়ে পঞ্চাশজন র‍্যাটস কিলরকে চাকরি দিয়েছেন। তাদের কাজ হল, প্রতি রাতে অন্তত তিরিশটা করে ইঁদুর মারা। পরে নেটে দেখলাম, ইউরোপের নামি শহরগুলোতেও মানুষ কোণঠাসা ইঁদুরদের জন্য। ইংল্যান্ড ও জার্মানিতে না কি ইঁদুরের সাইজ এমন বিপজ্জনকভাবে বাড়ছে যে, বিড়াল এগিয়ে দিয়েও তাদের বধ করা যাচ্ছে না। রাশিয়ার কোনো এক শহরে ইঁদুরের আক্রমণে বিড়াল পালাচ্ছে, এমন ছবিও খবরের কাগজে প্রকাশিত হয়েছে। রোডেন্ট অর্থাৎ ইঁদুর জাতীয় প্রাণী বিশেষজ্ঞদের মতে আগামী কুড়ি-পঁচিশ বছরের মধ্যে ইঁদুরদের জিনগত অনেক পরিবর্তন হবে। তার লক্ষ্মণ টের পাওয়া যাচ্ছে। সেইসময় একেকটা ইঁদুরের ওজন হয়ে যেতে পারে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ কেজির মতো।

এই উপন্যাসটি লেখার সময় নিউ আলিপুরের জুলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার কয়েকজন বিজ্ঞানীর সাহায্য যেমন নিয়েছি, তেমনই পুরাণের। মনে একটা প্রশ্ন জেগেছিল, ইঁদুর কেন গণেশের বাহন? অনেক খুঁজে শেষ পর্যন্ত মানেকা গান্ধির একটা লেখায় তা জানতে পেরেছিলাম। পুরাণে অনেক দার্শনিক ব্যাখ্যাও রয়েছে। তবে, বিজ্ঞানীরা যে ব্যাখ্যাটি দেন, তা সহজবোধ্য। মানুষের হাত থেকে ছোটো

প্রাণীদের রক্ষা করার জন্য, একেকটিকে দেবতাদের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। দেবতাদের কোপে পড়ার ভয়ে মানুষ যাতে সেই প্রাণীর প্রাণহানি না করে। করলে ইকোলজিক্যাল ব্যালান্স নষ্ট হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা। ইঁদুর অবশ্য মানুষের উপকারে আসে না। উলটে, দুরারোগ্য রোগ ছড়িয়ে, ফসল নষ্ট করে ক্ষতিই বেশি করে। তা সত্ত্বেও, পুরাণকাররা কেন তাকে দেবতার সঙ্গে জুড়ে দিলেন, তার সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পাইনি।

বিশ্বের বহু দেশে মানুষ ইঁদুর খায়। ইউরোপে ইদানীং ইঁদুরকে অন্যভাবেও কাজে লাগানো হচ্ছে। খবরে দেখলাম, কোপেনহাগেনে মাদক তল্লাশির কাজে আগে কুকুরদের সাহায্য নেওয়া হত। কিন্তু কুকুর পোষার খরচ দিনকে দিন বেড়ে যাচ্ছে বলে, এখন ট্রেনিং দিয়ে সেই কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে ইঁদুরদের! এয়ারপোর্টে মালপত্তর তল্লাশির সময় ইঁদুরই গন্ধ শুঁকে বলে দিচ্ছে, কোন্ ব্যাগে মাদক আছে। ইঁদুরের মতো ইন্টেলিজেন্ট প্রাণী খুব কমই আছে। সেই কারণে বিব্রত পেস্ট কোম্পানির কর্তারা। তাঁরা নিত্যনতুন উপায় বের করছেন, ইঁদুরদের জব্দ করার জন্য। আর ইঁদুররাও তা বুঝতে পেরে ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকছে। ইঁদুরের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে এই উপন্যাসের নায়ক অ্যান্ডি ওরফে ইন্দ্র, তাদের বাগে আনতে চেয়েছিল। সে কতটা সফল হল, তা জানতে পারা যাবে, উপন্যাসটি পড়লে।

জানুয়ারি, ২০১৫ রূপক সাহা

টার্ফ রোডের মোড়ে বাইকের ইঞ্জিনটা বন্ধ করে আনন্দ বলল, 'নেমে পড় ইনডি। তোদের পাড়ার এই নতুন রেস্টুরেন্টটায় একবার ঢুঁ মারা যাক। চল, দেখে আসি, কী ধরনের খাবার পাওয়া যায়।'

শুনে ব্যাকসিট থেকে ইন্দ্র নেমে পড়ল। দিন দুয়েক আগে মোড়ের মাথায় নতুন একটা রেস্টুরেন্টের উদ্‌বোধন হয়েছে। আনন্দের মুখেই ইন্দ্র শুনেছে, সেদিন টিভি সিরিয়ালের দুজন নায়িকা নাকি রেস্টুরেন্টটায় এসেছিল। ওদের দেখার জন্য পাড়ার লোক খুব ভিড় জমিয়েছিল। রেস্টুরেন্টের ব্যাপারে আনন্দের আলাদা ইনটারেস্ট আছে। কলকাতায় কোথায় কোন্ রেস্টুরেন্টে কী খাবার পাওয়া যায়, প্রায় সব ওর নখদর্পণে। শ্যামবাজার থেকে গড়িয়া... বাইক নিয়ে সর্বত্র ও চষে বেড়ায়। কোথাও নতুন কোনো রেস্টুরেন্ট হয়েছে শুনলে, ও চেষ্টা করে ওপেনিংয়ের দিন হাজির থাকার। খাবারের স্বাদ নিয়ে এসে গল্প করে ইন্দ্রের কাছে।

কলেজ থেকে ফেরার সময় আনন্দ বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দেয় ইন্দ্রকে। তার পর ডান দিকে বাঁক নিয়ে ডি এল খান রোড ধরে চলে যায় হেস্টিংসের দিকে। আনন্দের বাবা কনকেন্দু রায় পিডবলিউডি-র ইঞ্জিনিয়ার। ওরা থাকে হেস্টিংসে সরকারি কোয়াটার্সে। ইন্দ্রর বাড়ি টার্ফ রোডের অনেকটা ভিতরে। রোজ সন্ধে ছটা-সাড়ে ছটার মধ্যে ওকে বাড়ি ফিরে আসতেই হয়। কোনো কারণে দেরি হলে ও ছটফট করে। ময়দানে ইনটার কলেজ ফুটবলের খেলা ছিল বলে আজ ইতিমধ্যেই সাড়ে ছটা বেজে গিয়েছে। এই সময় আনন্দের সঙ্গে রেস্টুরেন্টে ঢুকলে রাত আটটার আগে ও ছাড়া পাবে না। বাড়িতে অনেক অশান্তি হয়ে যাবে। সে কথা ভেবে ইন্দ্র বলল, 'না ভাই। তুই একাই রেস্টুরেন্টে যা। আজ আমার একটু তাড়া আছে।'

আনন্দ পাত্তাই দিল না কথাটার। বাইক থেকে নেমে হেলমেট খুলে বলল, 'তোর পাড়ায় এসে আমি একা একা খেয়ে চলে যাব, ভাবলি কী করে তুই ইনডি? যা বলছি, শোন। বাইকটা পার্ক করে আসছি। আজ আইটেম লেবানিজ ফুড। তোকে খেতে হবে আমার সঙ্গে।'

আনন্দের মতো ভালো বন্ধু আর ওর নেই বললেই চলে। ইন্দ্র তাই দাঁড়িয়ে পড়ল। দুজনই প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ে। কলেজে ইন্দ্রকে সবাই ডাকে ইনডি বলে। আনন্দের নাম হয়ে গিয়েছে অ্যানডি। সারাদিনে আট থেকে দশ ঘণ্টা সময়

ওরা দুজন একসঙ্গে কাটায়। কলেজের ফুটবল টিমে দুজনই স্ট্রাইকার পজিশনে খেলে। টেবল টেনিস টুর্নামেন্টে ডাবলস পার্টনার। আনন্দ ওর এত উপকার করে যে, ইন্দ্র কখনোই কোনো ব্যাপারে ওকে না করতে পারে না। মুশকিল হল, রেস্টুরেন্টে ঢুকলে আনন্দ কিছুতেই ওকে বিল মেটাতে দেয় না। আজও কিছু ফালতু খরচা করবে। সেই কারণে ইন্দ্র একবার শেষ চেষ্টা করল, 'প্লিজ, তুই জিদ ধরিস না অ্যানডি। বাড়িতে এক্ষুণি ফিরে না গেলে আমায় ভয়ানক মুশকিলে পড়তে হবে।'

আনন্দ বলল, 'এই... চপ দিস না। তোর বাড়িতে তুই আর তোর বাবা ছাড়া তো আর কেউ নেই। কে তোকে মুশকিলে ফেলবে? সিঙ্কিং সিঙ্কিং ড্রিঙ্কিং ওয়াটার নাকি ভাই? কে মেয়েটা? সাবরমতী নাকি?'

নাম শুনে ইন্দ্র হেসে ফেলল। ওদের বাড়ির উলটো দিকে পারিজাত বলে নতুন একটা অ্যাপার্টমেন্ট হয়েছে বছর খানেক আগে। তারই গ্রাউন্ড ফ্লোরের ফ্ল্যাটে মায়ের সঙ্গে থাকে সাবরমতী বলে একটা মেয়ে। শাঁখারি পাড়ার পুজো প্যান্ডেলে আলাপ হয়েছিল সেই মেয়েটার সঙ্গে। তারপর থেকে রাস্তা-ঘাটে দেখা হলে প্রায়ই যেচে কথা বলে। একদিন বোধহয় সাবরমতীকে ওর সঙ্গে কথা বলতে দেখেছিল আনন্দ। ও ধরেই নিয়েছে, ইন্দ্র প্রেমে পড়েছে। আনন্দ নিজে অবশ্য প্রেম করে। সে কথা খুল্লমখুল্লা জানাতে ও দ্বিধাবোধ করে না। ওর গার্লফ্রেন্ডের নাম কোয়েল। থাকে ভবানীপুরে। আনন্দ খুব স্বচ্ছল পরিবারের ছেলে। ওর পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়, প্রেম করার ভাবনাটাই ইন্দ্রর কাছে বিলাসিতা!

উত্তরের আশায় আনন্দ ভ্রু কুঁচকে তাকিয়ে রয়েছে। কাউকে যাচাই করার সময় এমনভাবেই ওর ভ্রু কুঁচকে থাকে। মজা করার জন্য ইন্দ্র একবার ভাবল... বলে, 'হ্যাঁ, সাবরমতী।' কিন্তু, বললে আনন্দ ওর মাথা খারাপ করে দেবে। দিন-রাত ফোন করে জানতে চাইবে সাবরমতীর কথা। একটা মিথ্যে কথা বলে, সেটা ঢাকার জন্য ওকে আরও দশটা মিথ্যে বলতে হবে। তার চেয়ে এড়িয়ে যাওয়াই ভালো। আনন্দের সন্দেহ মিটিয়ে দেওয়ার জন্য ইন্দ্র একটু জল মিশিয়েই বলল, 'তোর মাথা খারাপ? সাবরমতী আমার জন্য ওয়েট করবে কেন? রাস্তায় দেখা হলে ও তো আজকাল আমার দিকে তাকায়ও না।'

কথাটা শুনে বিশ্বাস করে নিল আনন্দ। এমন সহজ-সরল টাইপের। সাবরমতীর কথা ভুলে গিয়ে ও বলল, 'তুই একটু দাঁড়া ভাই। আমি এক্ষুণি আসছি।'

রেস্টুরেন্টের সামনেই বাইক পার্ক করার জায়গা রয়েছে। হেলমেট আর ল্যাপটপের ব্যাগটা ওর হাতে ধরিয়ে দিয়ে আনন্দ সেখানে বাইক রাখতে গেল।

প্রায় ছফুটের মতো লম্বা। খিদিরপুরের কোনো এক জিম-এ নাকি আনন্দ আগে নিয়মিত ব্যায়াম করতে যেত। ওর হাতের মাস্‌ল দেখলেই সেটা বোঝা যায়। ওর অ্যাম্বিশন, আইপিএস হবে। শেষে লাল বাজারের পুলিশ কমিশনার। সেই কারণেই নিজেকে ও তৈরি করছে। দূর থেকে আনন্দের দিকে তাকিয়ে ইন্দ্র দীর্ঘশ্বাস ফেলল। এই কিছুদিন আগে ওর নিজেরও একটা ইচ্ছে ছিল। এখন আর সেটা নেই। সেই ইচ্ছের পিছনে দৌড়োনোর তাগিদটা ক্রমশই ও হারিয়ে ফেলেছে।

চোখ ফিরিয়ে ইন্দ্র এ বার রেস্টুরেন্টের দিকে তাকাল। পাড়ায় এত ঘটা করে একটা রেস্টুরেন্ট চালু হল, অথচ তার নামটাও লক্ষ করেনি ও। আলোয় ঝলমল করছে আশপাশটা। ইন্দ্র দেখল, নিওন আলোয় ইংরেজিতে লেখা, শাওয়ারমা। ও বুঝতেই পারল না, শাওয়ারমা কথাটার মানে কী? কোনো রেস্টুরেন্টের এ রকম নাম হতে পারে নাকি! বোর্ডে অনেক ধরনের খাবারের নাম লেখা আছে। তার মধ্যে একটা ওর চেনা... মোমো। লেক গার্ডেন্সের মোড়ে একটা দোকানে নিয়ে গিয়ে একবার আনন্দ ওকে মোমো খাইয়েছিল। মাংসের পুর দেওয়া পিঠে জাতীয় খাবার। টিবেটিয়ান ফুড। খেতে সেদিন মন্দ লাগেনি। কিন্তু দাম শুনে ওর চোখ মাথায় উঠে গিয়েছিল। এক প্লেটের দাম পঞ্চান্ন টাকা!

শাওয়ারমা নিয়ে মাথা ঘামানোর সময়ই ইন্দ্র শুনতে পেল, কে যেন বলছে, 'আরে ধম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির, তুই এখানে?'

ঘুরে তাকিয়ে ইন্দ্র দেখল, রতন মিত্তির। কাঁসারিপাড়ার মিত্তির বাড়ির ছেলে। মিত্র ইন্সটিটিউশন স্কুলে ওর সঙ্গেই পড়ত। ক্লাস নাইনে বারদুয়েক ফেল করে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছিল। রতনের পরনে সাদা জ্যাকেট, ট্রাউজার্স আর সাদা জুতো। গলায় সোনার চেন, আঙুলে দামি পাথর বসানো কয়েকটা আংটি। কাঁসারিপাড়ার বাড়ি বিক্রি করে রতনরা বছর খানেক আগে চলে গিয়েছে গড়িয়ার দিকে। অনেকদিন ওর সঙ্গে দেখা হয়নি। ওকে দেখে একটু অস্বস্তি বোধ করল ইন্দ্র। স্কুলে হাফ ইয়ার্লি পরীক্ষার সময় একবার টোকাটুকি করেছিল রতন। হেডমাস্টার মশাই জিজ্ঞেস করায় সেবার সত্যি কথাটা বলে দিয়েছিল ইন্দ্র। তারপর থেকে রতন ওকে ডাকত ধম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির বলে। বহুদিন পর ওই ডাকটা শুনে ইন্দ্র হাঁ করে তাকিয়ে রইল।

ও কোনো উত্তর দেওয়ার আগেই রতন ফের জিজ্ঞেস করল, 'কারও জন্য ওয়েট করছিস বুঝি? গার্লফ্রেন্ড নাকি?'

ইন্দ্র বলল, 'না। আমার কলেজের এক বন্ধু। বাইক রাখতে গিয়েছে। কিন্তু, তুই এখানে?'

'এটা তো আমারই রেস্টুরেন্ট। দুটো দোকান কিনে আমিই রেস্টুরেন্টটা খুলেছি। কেন, আমার হ্যান্ডবিল তুই পাসনি? দিন সাতেক ধরে তো পাড়ায় আমি হ্যান্ডবিল বিলি করেছি! ইচ্ছে ছিল, পুজোর আগে রেস্টুরেন্টটা খুলব। কিন্তু, পারলাম না।'

ইন্দ্র মাথা নেড়ে জানাল, ও হ্যান্ডবিল পায়নি। এতক্ষণ পর ওর খেয়াল হল, টার্ফ রোড আর শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রিটের মোড়ে... এই জায়গাটায় এই ক'দিন আগেও পাশাপাশি দুটো দোকান ছিল। একটা ওষুধের দোকান, অন্যটা গম ভাঙানোর। ওষুধের দোকানটার কথা ও ভুলে গেল কী করে? দোকানটার নাম ছিল মেডিকো। ওই দোকান থেকেই তো এক্সপায়ারি ডেট পেরিয়ে যাওয়া ওষুধ ও কিনে নিয়ে গিয়েছিল অসুস্থ মায়ের জন্য। কেনার সময় চেক করেনি। শেষ পর্যন্ত মাকে বাঁচাতে পারেনি। পরে মেডিকোর মালিক অবশ্য দোষ স্বীকার করেনি। কিন্তু, পাড়ার ছেলেরা তখন দোকানটা ভাঙচুর করেছিল। ফলে ইন্দ্রকে একরাত্তির থানার লক আপে কাটাতে হয়েছিল।

রাস্তার উলটো দিকে বাঙ্গুর ইন্সটিটিউট অফ নিউরো সায়েন্সেস হাসপাতাল। সারাদিন ধরে এই অঞ্চলটায় রোগীদের আত্মীয়স্বজনের ভিড় লেগেই থাকে। পুবদিকে পিজি হাসপাতাল পর্যন্ত শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রিটের দুপাশে প্রচুর ওষুধের দোকান। সেই তুলনায় ভালো খাবারের দোকান বা রেস্টুরেন্ট অনেক কম। মনে মনে রতনের তারিফ করল ইন্দ্র। খুব বুদ্ধিমানের কাজ করেছে রেস্টুরেন্ট খুলে। রোগীদের আত্মীয়স্বজনরা রতনের রেস্টুরেন্টে ভিড় করবেই। ভালো খাবারের জন্য লোকে আজকাল পয়সা খরচে কার্পণ্য করে না। আনন্দকে দেখেই ও সেটা বুঝতে পারে। ঘুরে ফিরে ইন্দ্রর মনে সেই প্রশ্নটাই এল, শাওয়ারমা কথাটার মানে কী? রতন যখন মালিক, নিশ্চয় বলতে পারবে।

ইন্দ্র প্রশ্নটা করতেই পিছনে এসে দাঁড়ানো আনন্দ বলে উঠল, 'শাওয়ারমা হল এক ধরনের লেবানিজ খাবার। চল ইন্দ্র, আজ এখানে শাওয়ারমা টেস্ট করা যাক। গত বছর বেঙ্গালুরুর এক রেস্টুরেন্টে খেয়েছিলাম। অপূর্ব টেস্ট। একটা পিস খেলে পেট ভরে যাবে। তোকে আর আজ ডিনার করতে হবে না।'

রতনের সঙ্গে আনন্দর পরিচয় করিয়ে দিল ইন্দ্র। উৎসাহ দেখিয়ে নিজের নেমকার্ড এগিয়ে দিয়ে রতন বলল, 'ভিতরে এসো আনন্দ। শ্যেফকে আমি বলে দিচ্ছি, যাতে তোমাদের জন্য ভালো করে বানায়।'

কার্ডে একবার চোখ বুলিয়ে নিল আনন্দ। তারপর ভোজনরসিকের মতো জিজ্ঞেস করল, 'তোমার এখানে শিশতায়ুক বা ফাত্তুশ পাওয়া যায়?'

শুনে রতন অবাক হয়ে বলল, 'এ গুলো কী ভাই?'

'শাওয়ারমার মতন এগুলোও লেবানিজ খাবার। বেঙ্গালুরুতে আরও খেয়েছিলাম কিবেহ নায়ুহ, মাকডুস। কোনোটা প্যাটিস, কোনোটা ডেজার্ট। তোমার শেফকে বোলো, যাতে এ সব ডিশ রাখে। আমাদের বয়সি ছেলেমেয়েদের তা হলে তুমি টানতে পারবে। মোগলাই পরোটা আর কাটলেটের দিন আর নেই। ওসব নর্থ ক্যালকাটার দিকে চলে। সাউথ ক্যালকাটার ছেলেমেয়েরা এখন খায় না।'.

খাবার নিয়ে আনন্দ এতসব জানে দেখে রতন গদগদ হয়ে বলল, 'ঠিক বলেছ ভাই। শেফকে আমি তোমার কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি। যা বলার, ওকে বলে যেও। যাতে কাল থেকেই নতুন কয়েকটা ডিশ চালু করে দিতে পারে।'

কথাগুলো বলেই রতন হন্তদন্ত হয়ে রেস্টুরেন্টের ভিতরে ঢুকে গেল। আনন্দের সঙ্গে ইন্দ্রও পা বাড়াল গেটের দিকে। এমন সময় ওর বুক পকেটে টুং করে একটা শব্দ হল। ও টের পেল, মোবাইল ফোনে মেসেজ এসেছে। পকেট থেকে সেটটা বের করে মেসেজ খুলতেই ইন্দ্র চমকে উঠল। মেসেজ পাঠিয়েছে সাবরমতী! লিখেছে, 'আই অ্যাম ইন ডেঞ্জার। আই নিড ইয়োর হেল্প। প্লিজ ফলো মাই লোকেশন ইন গুগল ম্যাপ।'

সোজা সাপটা যার মানে... সাবরমতী ভয়ানক কোনো বিপদে পড়েছে! সাহায্য চায়। কিন্তু, এত লোক থাকতে ওর কাছে মেসেজ পাঠাল কেন, ইন্দ্রর তা বোধগম্য হল না। এটা ঠিক, সাবরমতীদের বাড়িতে ওর মা ছাড়া আর কেউ নেই। ওর মা চাকরি করেন সল্টলেকের কোনো এক কর্পোরেট অফিসে। সন্ধে সাতটার আগে সাধারণত উনি বাড়ি ফেরেন না। কলকাতায় ওদের চেনা পরিচিত আর কেউ আছেন কি না, তা জানার মতো ঘনিষ্ঠতা ওর নেই সাবরমতীর সঙ্গে। ইন্দ্র শুধু জানে, গুজরাতের সুরত থেকে ওরা কলকাতায় এসেছে। এই শহরের রাস্তাঘাট... বলতে গেলে সাবরমতী তেমন চেনে না। রোজ বাসে করে সোজা ও লা মার্টিনিয়ার স্কুলে যায়। বাসে করেই আবার ফিরে আসে।

তা হলে বিপদে পড়লটা কোথায়? বাড়িতে, না রাস্তায়? আজকাল কাগজে কত রকম খারাপ খারাপ খবর বেরোয় মেয়েদের নিয়ে। কথাটা মনে হতেই ইন্দ্রর শরীরের ওপর থেকে একটা ঠান্ডা স্রোত নীচের দিকে নামতে লাগল। ঠিক এই অনুভূতিটাই ওর আরও একবার হয়েছিল। মেডিকো থেকে ওর আনা ওষুধ খেয়ে মাকে মৃত্যুশয্যায় ছটফট করতে দেখে।

রেস্টুরেন্টের গেটের দিকে দুপা এগিয়েও আনন্দ দাঁড়িয়ে পড়েছে। ওর চোখমুখের অবস্থা দেখে নিশ্চয় কিছু আন্দাজ করেছে। পিছিয়ে এসে আনন্দ জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে রে তোর ইনডি? কে তোকে মেসেজটা পাঠাল? কোনো খারাপ খবর নাকি?'